# একটি লাল দালানের স্মৃতি

আবদুল গাফফার চৌধুরী

ঢাকার প্রেস ক্লাব এখন জাতীয় প্রেস ক্লাব। কিন্তু আমার কাছে এখনও এই ক্লাবের কথা মনে হলেই ঢাকার একটি লাল দালানের স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই দোতলা লাল দালানটি এখন নেই। তার পেছনের সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রশস্ত ব্যাক ইয়ার্ড, যেখানে উন্মুক্ত আকাশতলে বসে আমরা আড্ডা দিতাম আর চা খেতাম, সেটিও এখন নেই। সব বদলে গেছে। কিন্তু স্মৃতি তো বদলায় না। তাই আমার জানা প্রেস ক্লাবের কথা মনে হলেই একটি লাল দালানের স্মৃতি আমাকে ঘিরে ফেলে। আর মনে পড়ে কয়েকটি মুখ। উমিদ খান, আবদুল হক, আবদুল কুদ্দুস আরও কত কে, প্রেস ক্লাবের জন্ম থেকে এরা তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বেয়ারা বলে পরিচয় দিলে এদের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হবে না। আমার দেখা লাল দালানটি তো শুধু ইট কাঠ সুরকিতে তৈরি ছিল না। উমিদ খানেরা ছিলেন এই ভবনের আসল প্রাণ। আমাদের সকলের পরম আত্মীয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু জাতীয় প্রেস ক্লাব পরিদর্শনে এসে আবদুল হককে বুকে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলেছিলেন। লাল দালানটির মত এরাও এখন নেই।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের (এবং বঙ্গভঙ্গও) আগে ঢাকায় তোপখানা রোডের এই লাল দালানটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাসগৃহ। ঢাকা তখন জেলা টাউন। তোপখানা থেকে রমনা, নীলক্ষেত পর্যন্ত বিছানো লাল দালানগুলো ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে সংরক্ষিত বাসভবন। তার আগে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রথমবারের মত ভাগ হয়ে ঢাকা শহর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী হলে উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের থাকার জন্যে নাকি সারা রমনা জুড়ে এই লাল দালানগুলো তৈরি হয়েছিল। অনতিকাল পরেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই ভবনগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষকদের দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে আবার বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হলে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় এই লাল দালানের অনেকগুলোই মন্ত্রী ও সচিবদের বাসভবনে পরিণত হয়।

১৯৪৮ সালে মফস্বল শহর বরিশাল থেকে (তখন আমি স্কুলের ছাত্র) ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলাম। সেক্রেটারিয়েটের পাশে এই লাল দালানটির গেটে আমি সেন্ট্রি খাড়া থাকতে দেখেছি। অর্থাৎ ভবনটি মন্ত্রীর বাড়ি। ১৯৫০ সালে বরিশাল থেকে পাকাপাকিভাবে ঢাকায়

এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। তখন একবার তোপখানা রোডের লাল দালানে ঢোকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কি একটা ব্যক্তিগত কাজে নূরুল আমিন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী আফজাল মোক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল। তার বাড়িও আমার জেলায়– সাবেক অবিভক্ত বরিশালে। তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভাগ্নে। তখন মন্ত্রী হিসেবে তিনি এই বাড়িতে থাকেন। তোপখানার লাল দালানটিতে সেই আমার প্রথম প্রবেশ।

তারপর দীর্ঘকাল এই বাড়িটাতে ঢোকার সুযোগ আমার আর হয়নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের অধিকারী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করার পর যখন স্বাধীন সাংবাদিকতা ক্রমশই সরকারী হুমকির সম্মুখীন, তখন দৈনিক সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত খায়রুল কবীর ঢাকার সাংবাদিকদের সংগঠিত করা এবং সাংবাদিকতার উন্নয়নের জন্যে একটি প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি ঢাকায় তখনকার প্রতিষ্ঠিত নবীন ও প্রবীণ সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং তাদের সহযোগিতায় এই উদ্যোগটি নেন। এই প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী, পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) অবজারভারের আবদুস সালাম, দৈনিক আজাদের আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল ওহাব প্রমুখ।

তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের প্রেস কনসালটেটিভ বডির সভায় ঢাকার সাংবাদিকদের জন্যে একটি প্রেস ক্লাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী ভবন কম ভাড়ায় অথবা অন্য কোনওভাবে বরাদ্দ করার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। প্রাদেশিক সরকারের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি এন এম খান (নিয়াজ মোহাম্মদ খান) তাতে সম্মত হন এবং প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্যে তোপখানার লাল দালানটি বরাদ্দ করা হয়। তখন গোটা উপমহাদেশে দিল্লি এবং কলকাতা ছাড়া আর কোথাও প্রেস ক্লাব ছিল না। দিল্লির প্রেস ক্লাবটি ছিল জিমখানার একটি ছোট্ট ঘরে অবস্থিত। কলকাতার প্রেস ক্লাবটিও ছিল ভাড়া করা একটি ছোট কুঠুরিতে। ঢাকায় প্রথম উপমহাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রেস ক্লাব একটি দোতলা ভবনের সবটা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে এই প্রেস ক্লাবের একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট হন দৈনিক আজাদের উপ সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ এবং সেক্রেটারি হন দৈনিক সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয় এবং মুজীবুর রহমান খাঁ আবার প্রেসিডেন্ট হন। জহুর হোসেন চৌধুরী সেক্রেটারি পদে কাজ চালাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে দৈনিক সংবাদের আরেক সাংবাদিক আবদুল মতিন (বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী) সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগের কথা লিখছি। যদি আমার বিবরণে কোনও ভুল ত্রুটি থাকে, সহৃদয় পাঠকেরা শুধরে নেবেন।

ঢাকা প্রেস ক্লাবে প্রথম পাবলিক ফাংশনটি হয় ১৯৫৫ সালের ১৯ জুন তারিখে। এ সময় পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সি, সি, দেশাই করাচী থেকে ঢাকায় আসেন। তাঁকে প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে অন্যান্য দেশের আরও কয়েকজন রাষ্ট্রদূত প্রেস

ক্লাবে সংবর্ধিত হন। ঢাকা প্রেস ক্লাবের (পরে জাতীয় প্রেস ক্লাব) এক জন সাধারণ সদস্য ছিলাম আমি। এই ক্লাব নিয়ে আমার গর্ব করার কয়েকটি কারণ আছে। যে কয়টি মনে আছে, এখানে উল্লেখ করছি।

পাকিস্তান আমলে স্বৈরশাসক আইয়ুবের বশংবদ গভর্নর মোনায়েম খাঁ সম্পর্কে ঢাকার সাংবাদিকরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাকে প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, কখনও ঢুকতে দেওয়া হবে না। মোনায়েম খাঁ তার দীর্ঘ ৬ বছরের গভর্নরগিরির আমলে অনেক চেষ্টা করে, ভয় এবং প্রলোভন দেখিয়েও প্রেস ক্লাব থেকে কোনও আমন্ত্রণ আদায় করতে পারেননি। কখনও আসতে পারেননি।

আইয়ুবের প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে যখন দেশব্যাপী প্রতিবাদ ওঠে, তখন ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রথম প্রতিবাদ সভাটি প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা সাংবাদিকতার পিতৃপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মওলানা আকরম খাঁ এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। তখন ঢাকায় খুব কম সাংবাদিকের গাড়ি ছিল। বর্তমানে দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক এ বি এম মূসার একটি ছোট মোটর গাড়ি ছিল। তার হুড তুলে মওলানা আকরম খাঁকে তাতে বসানো হয়। তিনি সাংবাদিকদের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। অন্যান্য জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকেরা পায়ে হেঁটে মিছিলে সামিল হন।

১৯৬৪ সালে সরকারী ইন্ধনে ঢাকায় যে দাঙ্গা হয়, তা প্রতিরোধের জন্যে গঠিত দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির প্রথম সভা প্রেস ক্লাবের দোতলার ঘরটিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ, এমনকি জামায়াত নেতারাও যোগ দিয়েছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন হামিদুল হক চৌধুরীর মত রাজনৈতিক নেতা এবং তখনকার মিডিয়া টাইকুন। সকল জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হাজির ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও। এই সভাতেই 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ইশতাহারটি রচনা করা হয় এবং কয়েকজন নেতা এবং নেতৃস্থানীয় সম্পাদকেরা তাতে সই দেন। পরে এই ইশতাহার নিয়েই স্বাক্ষরদাতা নেতা ও সম্পাদকদের একটা মামলায় জড়িয়ে মোনায়েম সরকার তাদের দীর্ঘকাল হয়রান করার চেষ্টা করেছিলেন।

আইয়ুব আমলে ১৯৬৪ সালে ঢাকার ডি আই টি ভবনে প্রথম টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করা হলে ঢাকার প্রেস ক্লাবেই প্রথম টেলিভিশন সেটটি রাখা হয়েছিল। আইয়ুব খান কর্তৃক এই টেলিভিশন কেন্দ্র উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের ছবি প্রেস ক্লাবের দোতলার একটি ঘরে বসেই আমরা প্রথম দেখি। বস্তুত এর আগে আমি আর কখনও টেলিভিশন দেখিনি।

একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামেরও একজন শহীদ প্রেস ক্লাবের আগের লাল ভবনটি। একাত্তরের মার্চ মাসের সেই ভয়াল রাতে পাকিস্তানী হানাদারেরা কামান দেগে এই ভবনটি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। সে রাতে বন্ধু সাংবাদিক এবং ছড়া লেখক ফয়েজ আহমদ এই ভবনেই ছিলেন এবং গুরুতরভাবে আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শহীদ লাল দালানকে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই প্রেস ক্লাবের গেস্ট রুমেই আমার দু'জন পরম শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক উইলিয়ম ননী এবং আবদুল লতিফ খতিব বাস করতেন। দু'জনেই

এখন প্রয়াত। পঞ্চাশের দশকে ননী ছিলেন কলকাতার স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি এবং আবদুল লতিফ খতিব ছিলেন ডেইলি মর্নিং নিউজের সিনিয়র লীডার রাইটার। দু'জনেই অবাঙালী। কিন্তু আবদুল লতিফ খতিব মর্নিং নিউজের চাকরি করলেও বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলনের একজন নির্ভীক সমর্থক ছিলেন।

ঢাকার প্রেস ক্লাব বা লাল দালানকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। সব কথা অল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে আগের লাল দালানটি নেই। কালের পরিবর্তনে, উন্নয়নের ছোঁয়ায় নতুন এবং বিশাল ভবন তৈরি হয়েছে। আগের অধিকাংশ পরিচিত মুখ নেই। দৃশ্যপট বদলে গেছে। এসেছে নতুন মুখ, নতুন দৃশ্যপট। দীর্ঘ দুই দশক পর বিদেশ থেকে ঢাকায় গিয়ে (১৯৯৩ ও ১৯৯৭) জাতীয় প্রেস ক্লাবের এই নতুন ভবন আমি দেখেছি। ক্লাবটির নামও এখন ঢাকা প্রেস ক্লাব নয়, বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব। তবু যৌবনে দেখা প্রেস ক্লাবের সেই লাল দালানটি এখনও আমার মনে ভাস্বর। চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে।

লণ্ডন, ৭ ডিসেম্বর ২০০৪

*লেখক ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, অধুনালুপ্ত দৈনিক জনপদের সম্পাদক*